সম্পদের অভিশাপ

রজার মুডি

এই লেখাটি খনিবিশেষজ্ঞ রজার মুডি (Roger Moody) রচিত এবং ২০০৭ সালে প্রকাশিত *Rocks and Hard Places: The Globalization of Mining* গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ। সর্বজনকথার জন্য এটি অনুবাদ করেছেন ***অপরাজিতা দে***। এই লেখা দুই পর্বে প্রকাশিত হবে।

'আমাদের দোষ হলো, তামার চামচ মুখে নিয়ে জন্মাবার অভিশাপ আমাদের উপর।[১]

বিস্ময়কর এই ব্যাপারটা নিয়ে বহু বছর ধরেই তর্ক চলছে: যেসব স্বল্পোন্নত (বিশেষত অত্যধিক ঋণগ্রস্ত) দেশ খনির ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল থাকে, সেসব দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশের তুলনায় কম থাকে; আর কিছু দেশের প্রবৃদ্ধি তো একেবারে পড়তির দিকে থাকে। লাতিন আমেরিকার অন্য যে কোন দেশের তুলনায় জনসংখ্যার অনুপাতে সবচেয়ে বেশি বড়, মাঝারি ও ছোট আকারের খনি থাকার পরও বলিভিয়া সে অঞ্চলের সবচেয়ে দরিদ্র দেশ। এই দেশের পটশি প্রদেশে 'পাঁচ শতাব্দী ধরে বিপুল পরিমাণে রুপা উত্তোলন করা হয়েছে, কিন্তু তার ফলে মানব, সাংস্কৃতিক এবং প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে... পটশি অঞ্চলটি হল এই দেশের দরিদ্রতম এলাকার মধ্যে অন্যতম।'[২] ভারতের খনিজ সম্পদের অধিকাংশই ওড়িশা, বিহার ও ঝাড়খণ্ড থেকে সরবরাহ করা হয়। তার পরও অনেক বছর ধরে বিহার ভারতের স্বল্পোন্নত প্রদেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে এবং ২০০৫ সালে ভারতের ন্যাশনাল হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট কর্তৃক ওড়িশাকে দেশের দরিদ্রতম প্রদেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ভারতের খনিজ সম্পদের অধিকাংশই ওড়িশা, বিহার ও ঝাড়খণ্ড থেকে সরবরাহ করা হয়। তার পরও অনেক বছর ধরে বিহার ভারতের স্বল্পোন্নত প্রদেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে এবং ২০০৫ সালে ভারতের ন্যাশনাল হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট কর্তৃক ওড়িশাকে দেশের দরিদ্রতম প্রদেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এমনকি উন্নত এবং মধ্যম আয়ের দেশেও, সাধারণত সর্বাধিক খনিসমৃদ্ধ অঞ্চলগুলোরই পুঞ্জীভূত সম্পদের ভাগ সবার শেষে জোটে। প্রথম শিল্প বিপ্লবের শুরুর দিকে, ইংরেজ কাউন্টি কর্নওয়াল ছিল অ-লৌহ ধাতুর সবচেয়ে বড় ভাণ্ডার, ১৮৭০ সালে সেখানে ২০০০ টিন ও তামার খনি ছিল।[৩] তার পরও ১৯৯৮ সালে সর্বশেষ কূপটি বন্ধ হওয়ার সময় দেশের নিম্ন আয়ের শ্রমিকদের সর্বোচ্চ অনুপাত ছিল এই কর্নওয়ালে। পরিহাস এই যে এই শ্রমিকদের একটা অংশ এখন 'নস্টালজিয়া পর্যটন'-এ তাদের সেবা বিক্রি করে থাকে, যে শিল্প গড়ে উঠেছে হাজার হাজার অনুত্তোলিত শ্যাফ্‌ট ও পরিত্যক্ত হুইল হাউসকে ঘিরে।

সম্ভবত ১৯৯৩ সালে রিচার্ড অটিই প্রথম 'সম্পদের অভিশাপ' কথাটি ব্যবহার করেন।[৪] অবশ্য তারও আগে ১৯৮১ সালে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) খনিজ নির্ভর দেশের (প্রধানত আফ্রিকার) একটা বড় অংশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি শূন্য বা ঋণাত্মক বলে সতর্ক বার্তা দিয়েছিল। অনেক সময়ই এই 'অভিশাপে'র সাথে তথাকথিত 'ডাচ রোগ'-এরও সম্পর্ক থাকে। মোটা দাগে এই ডাচ রোগ হল এমন একটা অর্থনৈতিক অসুখ যখন কোন দেশের সম্পদের আকর্ষণে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রার আগমনে মুদ্রার বিনিময় হারের পতন ঘটে, সম্পদের মূল্য অস্থিতিশীল হয়ে যায় এবং সরকারের ধার দেনা বেড়ে যায়। শ্রম ও পুঁজি তুলনামূলক টেকসই খাত থেকে খনিজ উত্তোলন খাতের দিকে ধাবিত হয়, এবং দেশে উৎপাদিত পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা হারায়।[৫]

২০০৩ সালে বিশ্বব্যাংকের এক্সট্রাক্টিভ ইন্ডাস্ট্রিজ রিভিউ (ইআইআর) প্রকাশের পর সম্পদের অভিশাপ তত্ত্বটি আরও বড় জনপরিসরে প্রবেশ করে।[৬] বিশ্বব্যাংক স্বীকার করেছে যে প্রতিবছর সব উন্নয়নশীল এবং পরিবর্তনশীল অর্থনীতির দেশে যেখানে মাথাপিছু জিডিপি গড়ে ১.৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, সেখানে রপ্তানি আয়ের ৫০ শতাংশের বেশি খনিজ সম্পদের ওপর নির্ভরশীল এমন দেশের জিডিপি ২.৩ শতাংশ হারে সংকুচিত হয়েছে।[৭] তবে সম্পদের অভিশাপ বিষয়টি বাস্তবে আছে কি নেই তা প্রমাণ করা বেশ কঠিন একটা কাজ। এ জন্য কোন্ ধরনের উপাত্তের ওপর আমাদের নির্ভর করা উচিত? খনিজ সম্পদ রপ্তানি বাবদ আয়ের ওপর নির্ভর করে মোট জাতীয় উৎপাদন বা জিডিপি পরিমাপ কতটুকু কার্যকর তা নিয়ে সন্দেহ আছে।

এই পদ্ধতিটি দেশের ভেতরে এই রপ্তানি আয়ের বণ্টন, দুর্নীতির মাধ্যমে লুণ্ঠন এবং পরজীবী (যদিও বৈধ) রাষ্ট্রীয় ব্যয় যেমন–টিউবওয়েল বসানোর পরিবর্তে বহুতল ভবন স্থাপন, বাস ও ট্রেনের পরিবর্তে ব্যক্তিগত গাড়ির পেছনে খরচ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নিতে সক্ষম নয়। এই সম্পদ উত্তোলন না করলে বা বিদেশের বদলে দেশের ভেতরেই মূল্য সংযোজন করা হলে তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কতটা মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে তারও কোন হিসাব এই পদ্ধতিতে করা হয় না। অধ্যাপক প্যাট্রিক বন্ড বলছেন, "এই ধরনের পাইকারি মূল্য-চুরির ফলে ঐতিহাসিক ও ক্রমশ আরও বিপজ্জনক 'প্রাথমিক পণ্য' নির্ভরতার ফাঁদে আটকা পড়তে হয়।"[৮] এ রকমই গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বিষয় হল, খনি অঞ্চলের মাটির উর্বরতা, বাতাসের বিশুদ্ধতা, পানির পরিমাণ ও গুণাগুণ, গাছপালা ও জীবজন্তু ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদের কী পরিমাণ ক্ষতি হল তা জিডিপির অঙ্কে কখনও ধরা পড়ে না এবং পড়া সম্ভবও নয়।

অধ্যাপক পল স্টিভেন্সের মতে, "তেল, গ্যাস বা খনিজ বহির্ভূত বাণিজ্যভিত্তিক জিডিপিই হল আসল; কারণ শেষ পর্যন্ত এর ওপর নির্ভর করেই অর্থনীতি টিকে থাকে।"[৯] তার পরও ওই বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি দেশের সীমানার ভেতরে বিদ্যমান জীবনযাত্রার মানের মধ্যকার সুস্পষ্ট পার্থক্যের কারণ ব্যাখ্যা করা যায় না। খনিতে সরাসরি কর্মরত পুরুষ ও নারীরা যদি যথাযথ অবকাঠামো, নির্ভরযোগ্য শক্তি সরবরাহ, এবং ভাল স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সুবিধা পায় তখন তারা হয়ত যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ সঞ্চয় করতে পারে, যা দিয়ে খনি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তারা চলতে পারবে। কিন্তু দেশের অন্যত্র অনিয়মিত বা অভিবাসী শ্রমিক হিসেবে কর্মরতদের পক্ষে এ রকম সঞ্চয় করার সম্ভাবনা খুবই কম। আর যেসব গ্রামবাসী জমি হারিয়েছে কিংবা যাদের মাছ ধরার জলা খনির বর্জ্যে নষ্ট

হয়ে গেছে, তাদের উন্নয়নের যে সম্ভাবনা নষ্ট হল, তার হিসাবই বা কিভাবে করা যেতে পারে?

জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন হচ্ছে নাকি অবনমন ঘটছে তা নির্ণয় করার জন্য আরও কার্যকর মাপকাঠি হল মানব উন্নয়ন সূচক (এইচডিআই)। অক্সফাম আমেরিকা 'একটি দেশের খনিজের ওপর নির্ভরতার মাত্রা এবং মানব উন্নয়ন সূচক (এইচডিআই)-এর মাঝে একটি শক্তিশালী নেতিবাচক সম্পর্ক লক্ষ করেছে: খনিজ সম্পদের রপ্তানি যত বাড়ে, সে দেশের জীবনযাত্রার মান তত বেশি খারাপ হয়।'[১০] ১৯৯০-এর দশকে 'খনিজ নির্ভর দেশগুলোর অবস্থা খারাপ হয়েছে: একটি দেশের খনিজ নির্ভরতার মাত্রা যত বেশি, ১৯৯০ ও ১৯৯৮-এর মাঝে সে দেশে এইচডিআই মাত্রা হ্রাস পাওয়ার পরিমাণ তত বেশি। নির্ভরতার মাত্রা যত বড়, দারিদ্র্যের মাত্রাও তত বেশি; শুধু তা-ই নয়, এর ফলে অর্থনীতির বহুমুখীকরণের মাধ্যমে টেকসই অর্থনীতি ও সকলের জন্য সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা আরও কঠিন হয়ে পড়ে।'[১১] ২০০৫ সালে বিশ্বব্যাংকের একটি গবেষণায় পানি, মাটি, গাছ ও খনিজ পদার্থ প্রতিস্থাপনের খরচ এবং তাদের ক্ষতি প্রতিরোধে ব্যর্থতার সামাজিক পরিণতি–উভয়ই যাচাই করার চেষ্টা করা হয়েছে। সমালোচকরা এর আগে যা যা বলেছিলেন তার বেশির ভাগই 'হয়্যার ইজ দ্য ওয়েলথ অব নেশন?' শীর্ষক গবেষণাটির মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছে: কেবলমাত্র সুশাসনের মাধ্যমে সকল নাগরিকের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য খনিজ সম্পদ কাজে লাগানো যায় না। কোন সময়ে, কী পদ্ধতিতে কোন ধরনের খনিজ সম্পদ উত্তোলন করা হচ্ছে তার সাথে দারিদ্র্য বিমোচনের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দুর্ভাগ্যবশত রিপোর্টটি দুনিয়াব্যাপী তুলনামূলকভাবে কম মনোযোগ পেয়েছে, বিশ্বব্যাংক নিজেও রিপোর্টটির দিকে তেমন মনোযোগ দেয়নি।[১২]

খনি অঞ্চলের মাটির উর্বরতা, বাতাসের বিশুদ্ধতা, পানির পরিমাণ ও গুণাগুণ, গাছপালা ও জীবজন্তু ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদের কী পরিমাণ ক্ষতি হল তা জিডিপির অঙ্কে কখনও ধরা পড়ে না এবং পড়া সম্ভবও নয়।

খনিজ সম্পদ উত্তোলনের মাধ্যমে উন্নত হয়েছে এমন দেশের দৃষ্টান্ত দিতে বললে কোম্পানির দালালরা সাধারণত অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা উলেখ করে থাকে। শুধুমাত্র ঐতিহাসিক ভিত্তিতে বিতর্কটি সন্দেহজনক; আর যখন তুলনাটি বর্তমান সময়ের স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সাথে করা হয়, তখন তা আর সমর্থনযোগ্য থাকে না। অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা–সবই ছিল (এবং এখনও আছে) বিপুল পরিমাণ কয়লা, লৌহ এবং অ-লৌহ জাতীয় খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এগুলো এসব দেশের শিল্পায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। এই সম্পদ হস্তগত করার জন্য প্রায়ই যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়েছে তাকে কোমল ভাষায় 'অভ্যন্তরীণ উপনিবেশীকরণ' বলা হয়, যা ছিল আসলে নির্মম এবং অনেক ক্ষেত্রে জাতিনির্মূলকারী যুদ্ধ যার মাধ্যমে উঁচুমানের খনিজ সম্পদের ওপর বসবাসকারী আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল।[১৩] সেই সময়ে বিপুল পরিমাণ কয়লাকে কোক কয়লায়, লোহাকে ইস্পাতে এবং তামাকে বৈদ্যুতিক তারে রূপান্তর করা হয়। রেলপথ, বাষ্পচালিত জাহাজ (এবং, অপরিহার্যভাবে, বোল্টটানা রাইফেল ও মেশিনগান সজ্জিত সৈন্যবাহিনী) দক্ষিণ এশিয়া এবং লাতিন আমেরিকায় খনিজ উত্তোলন প্রকল্পের সূচনা ঘটায় যা লক্ষ লক্ষ মানুষের টেকসই কৃষিকাজকে ধ্বংস করেছে এবং পাহাড়, সমতল ও বনভূমি বিদীর্ণ করেছে। আমরা এখনও জানি না তুলনামূলক অল্প কিছু মানুষের সুবিধার জন্য বহু মানুষের আসলে কত ক্ষতি করা হয়েছে।

অংশত এই সম্পদ চুরির কারণে এখন আর কোন খনিজ-সমৃদ্ধ স্বল্প-উন্নয়নশীল রাষ্ট্র নেই, যা একক প্রয়াসে নিজের উন্নয়নের জন্য এবং একটি প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক খনিজ ব্যবসায়ী রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার মত পর্যাপ্ত এবং যথেষ্ট বৈচিত্র্যপূর্ণ খনিজ সম্পদের অধিকারী। পশ্চিমের ওপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত হওয়ার প্রতিজ্ঞা নিয়ে চীন, ভারত ও রাশিয়া তাদের নিজস্ব ধরনের যুদ্ধোত্তর শিল্পায়ন ঘটিয়েছে সত্যি; তা ছাড়া তাদের নিজ সীমানায় রয়েছে বিপুল ও বৈচিত্র্যময় খনিজ সম্পদের ভাণ্ডার (যা নিয়ে তারা একে অপরের সাথে বাণিজ্য করে)। কিন্তু এই সাফল্যের জন্য দেশগুলোকে যে সামাজিক-বাস্তুসংস্থানগত মূল্য দিতে হয়েছে তা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। এই তিনটি দেশই তাদের খনিজ সম্পদ অর্জনের জন্য অভ্যন্তরীণ উপনিবেশীকরণের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল: চীন ১৯৫০-এর দশক থেকে এখন পর্যন্ত তিব্বতে[১৪]; ভারত, আদিবাসী নয় এমন ব্যক্তি বা বেসরকারি কোম্পানির কাছে আদিবাসী জমি হস্তান্তর করার সাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞা ধারাবাহিকভাবে অস্বীকার করে আসছে[১৫]; এবং রাশিয়া সরকারিভাবে 'উত্তরের সংখ্যালঘু আদিবাসী' বলে স্বীকৃত জনগোষ্ঠীর ভূমির নিষ্ঠুর দখলদারির মাধ্যমে।

আজ এই তিনটি দেশ সমষ্টিগতভাবে দুনিয়ার সবচেয়ে অনিষ্টকর বায়ু, পানি ও মাটি দূষণে ভুগছে, যে দূষণের একটি বড় অংশ খনি খনন ও খনিজ প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ঘটছে। এই দেশগুলোর নিজস্ব খনি কোম্পানিগুলো এখন আফ্রিকা, এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল এবং কখনও কখনও লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর দিকে ধাবিত হচ্ছে বিভিন্ন ধাতব ও জ্বালানি সম্পদের মজুদ দখল করার জন্য। তাদের মিশনটি হয়ত হুবহু ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমা জলদস্যুদের 'গ্রেট গেইমস'-এর মত নয়। পুরোটা দখল না করে তারা জয়েন্ট ভেঞ্চারের মাধ্যমে অনেক খনি ও প্ল্যান্ট ক্রয় করছে যার মধ্যে উত্তরের কোম্পানির সাথে চুক্তিও রয়েছে। তথাপি প্রশ্ন উঠতে পারে, যখন এসব দেশের নাগরিকরা নিজেরাই বর্তমানে চালু কিংবা পরিত্যক্ত বিভিন্ন খনির দ্বারা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, তখন তাদের এই খনিজ আহরণের অভিযান নৈতিকভাবে কতটা সমর্থনযোগ্য।

তাহলে কি এমন একটি দেশও নেই যা একসময় দারিদ্র্যপীড়িত ছিল এবং মূলত খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে আয়ের এবং বণ্টনের একটি ধারাবাহিক ও সামগ্রিক উন্নতি অর্জন করেছে? প্রায়ই দুটো দেশের উদাহরণ দেয়া হয় সম্পদের অভিশাপের ধারণাটিকে খারিজ করার জন্য। বতসোয়ানা ও চিলির অর্থনীতি খনিজ বিক্রির ওপর অত্যন্ত নির্ভরশীল এবং উভয়ই তাদের আঞ্চলিক প্রতিবেশী রাষ্ট্রের তুলনায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সামাজিক সেবার ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে।

বতসোয়ানা : হীরাই কি সেরা বন্ধু?

প্রথম দৃষ্টিতে দেশটির পরিসংখ্যানগুলোকে বেশ আকর্ষণীয়ই মনে হয়। সাব-সাহারার অন্যান্য দেশের তুলনায় বতসোয়ানার প্রবৃদ্ধির হার আদর্শ[১৬], দেশটির জনসংখ্যা কম, অভিজাত শ্রেণি বেশ উচ্চশিক্ষিত এবং দেশের দুর্নীতির মাত্রাও বেশ কম; সেই সাথে জোসেফ স্টিগলিজের ভাষায় দেশটির 'রীতিনীতি গণতান্ত্রিক, সম্মতিভিত্তিক ও স্বচ্ছ'।[১৭] বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বেশ বড় আকারে কিম্বারলি (হীরকবিশেষ) 'নলের' উত্তোলন শুরুর আগ পর্যন্ত, দেশটির জিডিপির পরিমাণ ছিল আনুমানিক ১.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০৫ সাল নাগাদ তা বেড়ে দশ গুণ (১০.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) হয়ে যায়।[১৮] তথাপি 'মুদ্রার বিনিময় হার বৃদ্ধি ও অর্থনীতির অতি উত্তপ্ত হয়ে যাওয়া এড়ানোর জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিমালার নিরিখে যা যা করা উচিত, তার সব কিছু করা সত্ত্বেও... ...১৯৯০-এর দশকে খনিজ সম্পদের মূল্যবৃদ্ধি থেমে যায় এবং সরকারি

কর্মসংস্থান সৃজনের প্রচেষ্টাও টেকসই হতে পারেনি কারণ শহুরে... ...বেকারত্ব বাড়তে থাকে।'[১৯]

বেশ উদ্বেগের একটা বিষয় হল, বতসোয়ানা এখন পর্যন্ত আসলে একটি 'এক-খনিজ' নির্ভর দেশ (দেশটি কিছু পরিমাণ তামা ও নিকেল উত্তোলন করে এবং সেখানে ইউরেনিয়ামের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক লাভজনক মজুদ রয়েছে)। বতসোয়ানায় বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান হীরার মজুদ রয়েছে এবং দেশটির সরকার এখন পর্যন্ত বিশ্বের নেতৃস্থানীয় হীরক বিপণনকারী ডি বিয়ারস-এর সাথে দর-কষাকষিতে ভাল করে চলেছে। তবে যে কোন সময় হীরার বৈশ্বিক চাহিদা কমে গেলে তা দেশটির নাগরিকদের জন্য বিপদ বয়ে আনতে পারে, তা ছাড়া উত্তোলিত রত্নগুলোর মানও যে কোন সময় পড়ে যেতে পারে।[২০] সম্প্রতি হীরকসমৃদ্ধ অঞ্চল থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করে গানা ও গুইয়ির ('বুশম্যান') মত দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবিকা বিপর্যস্ত করে ফেলার অভিযোগ উঠেছে দেশটির সরকারের বিরুদ্ধে। এখন পর্যন্ত বতসোয়ানা কিম্বারলি প্রসেস সার্টিফিকেশন স্কিমের (কেপিসিএস) সমস্ত বিধান সক্রিয়ভাবে বাস্তবায়ন করেছে এবং দেশটি এখনও 'রক্ত' বা 'বিরোধ'যুক্ত হীরার উৎস বা পাচারকেন্দ্র হয়ে ওঠেনি। তবে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সমর্থক সার্ভাইভাল ইন্টারন্যাশনাল ও গ্লোবাল উইটনেস (যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংগঠন, যা সাফল্যের সঙ্গে কিম্বারলি প্রসেস চালু করেছে) উভয়ই দেশটির সরকার কর্তৃক আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভূমি ও অন্যান্য অধিকারকে অস্বীকার করা বন্ধ না হলে দেশটির রত্ন বাণিজ্যের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপের আহ্বান জানিয়েছে।[২১] যদি কেপিসিএসের পরিধি আরও বাড়িয়ে (ধরা যাক) স্বাধীন দেশগুলোতে বসবাসকারী আদিবাসী ও ট্রাইবাল জনগোষ্ঠীর অধিকার সম্পর্কিত আইএলও কনভেনশন ১৬৯ লঙ্ঘনের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে বতসোয়ানা দ্বিমুখী সংকটে পড়বে: দেশটি কি উৎপাদিত হীরার বৈধতা নিশ্চিত করতে গানা এবং গুইয়ি অঞ্চলের হীরা উত্তোলন বন্ধ করে দেবে? নাকি এসব হীরা বাজারজাত করে আন্তর্জাতিক বয়কটের মুখে পড়বে?

চিলি : তামার পাতে মোড়া ভবিষ্যতের ওপর নির্ভরশীলতা

'আকাশে তামা উড়ছে, শিক্ষা মাটিতে লুটছে!'[২২]

চিলির পরিস্থিতিও ব্যতিক্রম। একমাত্র চিলিতেই বিশ্বমানের একটি খনি কোম্পানি রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রয়েছে। সারা বিশ্বের মধ্যে তামার একক বৃহত্তম মজুদ এই কোম্পানিটির মালিকানাধীন। দেশের প্রায় অর্ধেক রপ্তানি আয় তামা থেকে আসে, ফলে চিলির লাতিন আমেরিকার চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার পেছনে এই 'লাল ধাতুর' গুরুত্ব নিয়ে কোন দ্বিমত নেই। মার্ক্সবাদী প্রেসিডেন্ট সালভাদর আলেন্দে ১৯৭০ সালে নির্বাচিত হওয়ার এক বছর পর সকল বেসরকারি মালিকানাধীন তামার খনি জাতীয় করেন। ডানপন্থী বিরোধী দলের চক্ষুশূলে পরিণত হওয়ার মত এ রকম আরও অনেক সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ আলেন্দে নিয়েছিলেন, কিন্তু তামার খনি জাতীয়করণের বিষয়টিই মার্কিন প্রশাসন ও চিলির খনি থেকে তামা উত্তোলন করে মুনাফা অর্জনকারী মার্কিন কোম্পানি কেন্নেকট (এখন রিও টিন্টোর অংশ) এবং আনাকোন্ডার (১৯৭৭ সালে আরকোর কাছে বিক্রি হয়ে যায়) সাথে বিরোধ গভীর করে তোলে। এটি এখন ব্যাপকভাবে স্বীকৃত যে এ দুই খনি কোম্পানি সিআইএ এবং যোগাযোগ সংস্থা আইটিটির সাথে মিলে দেশের তামা সরবরাহে বিঘ্ন ঘটায় এবং সেই সাথে ১৯৭৩ সালের রক্তাক্ত অভ্যুত্থানে সমর্থন জোগায়, যার মাধ্যমে আলেন্দেকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছিল। অবশ্য খুব কম লোকই জানে যে একনায়ক অগাস্ত পিনোশে ১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তামা কোম্পানি কোডেলকোকে বাজেয়াপ্ত করেননি, কারণ এর সাথে দেশটির সামরিক বাহিনীর স্বার্থ যুক্ত ছিল। (চলবে...)

তথ্যসূত্র:

১. Kenneth Kaunda, former president of Zambia, cited in M. Ross, `The political economy of the resource curse', in World Politics, 51, January 1999, p. 297

২. Breaking New Ground: Mining, Minerals and Sustainable Development: The Report of the MMSD Project, Earthscan, London, 2002, p. 232.

৩. S, Payne, B. Henson, D. Gordon and R. Forrest, `Poverty and deprivation in West Cornwall in the 1990s', Statistical Monitoring Unit, School for Policy Studies, 2006, p. 6.

৪. R. Auty, Sustainable Development in Mineral Economics: The Resource Curse Thesis, Routledge, London, 1993.

৫. S. Pegg, `Poverty reduction or poverty exacerbation? World Bank group support for extractive industries in Africa', Report sponsored by Oxfam America, Friends of the Earth-US, Environmental Defense, Catholic Relief Services and the Bank Information Centre, 2003, p 15; K.Lahiri-Dutt, `"May God give us chaos, so that we can plunder": a critique of "resource curse" and conflict theories', Development, Society for international Development, Rome, September 2006, 49(3):15.

৬. P. Stevens, `Resource impact: a curse or a blessing?' (in draft), CEPMLP, Dundee, 2003, p. 4

৭. Pegg, `Poverty reduction', p. 14

৮. P. Bond, `Multinational capital's responsibility for Africa's resource extraction crisis', Paper for the Open Society Initiative for Southern Africa, 2006, p. 13.

৯. Stevens, `Resource impact', p. 6

১০. M. Ross, `Extractive sectors and the poor', Oxfam America, 2001, p. 8.

১১. পূর্বোক্ত

১২. Where is the Wealth of Nations? Measuring Capital for the 21st Century, World Bank, Washington, DC, 2005.

১৩.অস্ট্রেলিয়ায় এই প্রকৃয়ার বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দেখুন J. Roberts, Massacres to Mining: The Colonisation of Aboriginal Australia, Dove Communications, Blackburn (Australia), 1981; D.W. McLeod, How the West was Lost(self-published), Port Hedland, Australia, 1984. A good US backgrounder is A. Gedicks, New Resource Wars: Native and Environmental Struggle, South End Press, Boston, MA, 1993.

১৪.Tibet Information Service, `Mining Tibet: mineral exploitation in Tibetan areas of PRC', London, 2002.

১৫.দেখুন, R. Rebbapragada and K. Bhanumathi, `The Fifth Schedule of the Indian Constitution and the Samantha Judgment', Indigenous Law Bulletin, Sydney, November/December 2001. 5(13): 22-3.

১৬. Word Bank, Where is the Wealth of Nations? , p. 66.

১৭.J. Stiglitz, `We can now cure Dutch disease', Guardian, London, 18 August 2004.

১৮. World Bank Group, `Botswana at a glance', Washington DC, 11 August 2006.

১৯. Stevens, `Resource impact', p. 11

২০. `Looking for the via media in Botswana', Interview with Dr Robert Hitchcock, Professor of Anthropology at the Department of Anthropology and Geography in the University of Nebraska, Indian Minerals & Metals Review, April 2006.

২১. See `We support the Kimberly process', Mwegi, Gaberone, 10 October 2006; also Janine Roberts, `Masters of illusion: special report on the Bushmen of Kalahari', Ecologist, London, September 2003, pp. 34-43.

২২. ৩০ মে ২০০৬ তারিখে চিলির ছাত্র ধর্মঘটের একটা অন্যতম একটা স্লোগান ছিল এটা।